103

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

# প্রসঙ্গ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ২৫৩টি পদ শূন্য আছে বলিয়া আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা প্রেরিত ও গত মঙ্গলবারের ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, সংশ্লিষ্ট জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৫৮টি প্রধান শিক্ষকের ও ১৯৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে ঠিকমত লেখাপড়া হইতেছে না।

আমাদের দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ দীর্ঘকাল যাবৎই যেসব সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে সেই সব সঙ্কটের অন্যতম হইতেছে শিক্ষকস্বল্পতা। ইহাছাড়া জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, চেয়ার-বেঞ্চসহ শিক্ষা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, একশ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যকর্মে অবহেলা ইত্যাদি সমস্যা তো রহিয়াছেই। অন্যান্য সমস্যার মত শিক্ষকস্বল্পতা সমস্যা শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নহে অন্যান্য জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও কম-বেশী বিরাজমান। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক হিসাব মতেই সারাদেশে অবস্থিত ৩০,৯০৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ৩,০১৩টি প্রধান শিক্ষকের পদ ও ৭,৯৪৫টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। প্রশ্ন হইতেছে শিক্ষক সংকট থাকিলে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চলিবে কিভাবে? আর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যদি ঠিকমত লেখাপড়া না চলে তবে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করাই বা যাইবে কিভাবে? তাহাছাড়া সরকারী হিসাব মতে ৫৬৯টি গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই নাই। গ্রাম পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা এমনিতেই খারাপ। অভাব ও দারিদ্র্যবশত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র পিতা-মাতা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পরিবর্তে শৈশব-কৈশরেই কাজে লাগাইতে অধিক আগ্রহী হয়। নিজেদের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকিলে তাহাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত আগ্রহ যে আরো বাড়িয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

এই কিছুদিন আগেও আমাদের লক্ষ্য ছিল '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'। উক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক আগেই দেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়া আসিবার জন্য গ্রামে গ্রামে স্কোয়াড গঠন করা হয়, বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু হয়, চালু করা হয় 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচী। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আইন করা হয় যে, ৫ হইতে ১০ বছর বয়সের সকল অক্ষরজ্ঞানশূন্য শিশুকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা দায়ী থাকিবেন। প্রাথমিকভাবে সতর্ক করার পরও যদি অভিভাবকগণ স্ব স্ব ছেলে-মেয়েকে স্কুলে প্রেরণ না করেন তাহা হইলে উক্ত আইন অনুযায়ী অভিভাবকদের বিভিন্ন মাত্রার দন্ড প্রদানের বিধিও রাখা হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে না, ইহাই বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে ইতিমধ্যেই নীরবে মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। সরকার এখন ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হইবে বলিয়া ধারণা পোষণ করিতেছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা না গেলে এবং সকল গ্রামে অন্তত একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না করা হইলে উক্ত লক্ষ্যও সময়মত অর্জিত হইবে এমন ধারণা করিবার কোন কারণ দেখি না।

সত্য বটে যে, আমাদের দেশ দরিদ্র, আমাদের সম্পদ সীমিত। আর দরিদ্র দেশে যেকোন লক্ষ্য অর্জনই কঠিন। আবার ইহাও সত্য যে, বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, প্রতিটি গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা এখনো অর্জিত হয় নাই। কেন? ইহা কি সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে, নাকি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা ও গাফিলতির জন্য? প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজার হাজার শিক্ষকের পদ আজও শূন্য হইয়া আছে কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নানাবিধ সংকট মোচনের পথে একমাত্র বাধা কি সম্পদের সীমাবদ্ধতা। নাকি অন্য কিছু? এই সকল প্রশ্নের জবাব বাহির করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব উহার প্রতিকার অত্যাবশ্যক!

বিশ্ব ব্যাংকের এক হিসাব মোতাবেক এখন বাংলাদেশে ৬ হইতে ১০ বছর বয়সী শতকরা ১৫ ভাগ শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। অর্থাৎ এই বয়সী প্রায় ৩০ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। আবার যেসব শিশু স্কুলে যায় তাহাদের শতকরা ৪০ ভাগই পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয়। এই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি। বলা হইতেছে এই প্রকল্পের প্রাথমিক সাফল্য ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। সত্য বটে যে, সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করিতে হইলে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু শিশুদের শুধু বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেই শিক্ষা অর্জন তো নিশ্চিত হয় না। ইহার জন্য চাই বিদ্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক, সুন্দর পরিবেশ ও পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের অবাধ সরবরাহ। আমরা বিশ্বাস করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে আরও সচেতন ও সচেষ্ট হইবেন। আমরা মনে করি, বিগত বছরগুলিতে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে যে কাজ হইয়াছে উহার সুষ্ঠু মূল্যায়ন করিয়া কার্যকর এমনসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে যাহাতে ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। আমাদের সম্পদ সীমিত। কিন্তু যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইলে ও কাজের প্রতি সকলে আন্তরিক হইলে সীমিত সম্পদ নিয়াও সাফল্য লাভ করা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।